বন্ধু বিভূতিভূষণ

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

অনুবাদ : অনুরাধা কুণ্ডা

ভূমিকা

দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক— নীরদচন্দ্র চৌধুরী কৃত একটি সুপরিচিত, প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত। তাছাড়া বইটির বিভিন্ন অংশে, নানা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ উল্লেখিত হয়েছেন। নীরদচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ বয়সে তিনবছরের ছোটো-বড়ো হওয়া সত্ত্বেও সহপাঠী ছিলেন এবং সহপাঠী হওয়া সত্ত্বেও বন্ধু ছিলেন। সামাজিক, পরিবারের অবস্থানের বিপুল তারতম্য প্রকৃতিগত এবং আচরণগত বৈপরীত্য, শিক্ষাগত ও রুচিগত পার্থক্য, সর্বোপরি দুই ব্যক্তিত্বের প্রকাণ্ড আত্ম-সন্তুষ্টি সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের খোঁজ নীরদচন্দ্র দিয়েছেন, তা একেবারে ষোলো আনা নীরদচন্দ্রীয়। ব্যক্তিগত থেকে নৈর্বক্তিক হয়ে উঠতে নীরদচন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেই বিভূতিভূষণকে তিনি বর্ণনা করেছেন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়ে, বন্ধুত্ব সেখানে কোনোক্রমেই বাঁধা সৃষ্টি করেনি, উপরন্তু অন্য আলোচকরা যেখানে অগ্রসর হতে পারেননি, সেইসব অতি-ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও নীরদচন্দ্র অনায়াসে যাতায়াত করেছেন, সমালোচনা করেছেন, এবং রসে-বশে থেকেছেন, যার ফলে আলোচনাটি মুহূর্ত-কালের জন্যও থেমে থকেনি, একঘেয়ে হয়ে ওঠেনি।

আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে এই দুই বিপরীত মেরুর মানুষের বন্ধুত্বের কেন্দ্রে ছিল মননশীলতা, পাঠপ্রিয়তা এবং সাহিত্যানুরাগ। একজন তখনও অকৃতদার, আর বিভূতিভূষণের স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে চব্বিশ বছর বয়সেই, কলেজে পড়াকালীন। দুজন একই মেসের বাসিন্দা, দুজনেরই গভীর পাঠানুরাগ, অতএব দুই বন্ধুত্বের মান সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে উচ্চতর। সেই সুবাদে নীরদচন্দ্র যেমন জানিয়েছেন *পথের পাঁচালী* শেষ করার জন্য বন্ধুকে তাগাদা দেবার কথা, তেমনি জানিয়েছেন নারী ঘটিত বিষয়ে বিভূতিভূষণের প্রবল আগ্রহের গল্প। তথাকথিত জীবনীকার' যেখানে ভদ্রতার মোড়কে আবৃত করে বিভূতিভূষণের দার্শনিক-মননশীলতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে চিরাচরিত ভারতীয় তথা বঙ্গ মানসিকতায়, তাঁকে প্রায় দেবত্ব অর্পণ করেছেন, নীরদচন্দ্র সেখানে খাঁটি বন্ধুর অগ্রাধিকারে বিভূতিভূষণের ছোটো-বড়ো ভুল-ভ্রান্তি, খেয়াল-খুশি, এমনকী ছেলেমানুষি কীর্তি-কাহিনিগুলি নির্মমভাবে লিখেছেন। তাতে বিভূতিভূষণের যশ কিছুমাত্র লোপ পায়নি, হানিও হয়নি, বরং তিনি প্রতিভাত হয়েছেন এক অতীব রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে — যে মানুষ একেবারে আদ্যোপান্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালি, যে মানুষ স্ত্রী-বিয়োগের পর অসহায় একাকিত্বে ভোগেন, বন্ধু খোঁজেন, যাতে মন খুলে কথা বলতে পারেন, মেয়েরা প্রেমপত্র দিলে ভারি খুশি হন, আবার সেই মেয়ে বিয়ে করতে পারবেন না বলে চাকরি ছেড়ে চলেও আসেন, অ্যাংলো-ভারতীয় গণিকা দেখার

আশায় দু-ঘণ্টা রাস্তায় বসে থাকেন এবং বাড়ি ফিরে বন্ধুর বকুনি খান, দ্বিতীয় বিবাহের জন্য পাত্রী দেখতে যান বটে নীরদচন্দ্রকে নিয়ে কিন্তু বিবাহ আর করে উঠতে পারেন না। বিভূতিভূষণের বিড়ি সেবন, পাতলা গামছা ব্যবহার কোনোকিছুই নজর এড়ায়নি শৌখীন নীরদবাবুর, আবার মুগ্ধ হয়েছেন বন্ধুর পড়শোনার বিস্তৃতিতে। ব্যবহারিক ও রুচিগত পার্থক্য বজায় রেখে এমন বন্ধুত্ব বিরল, দুজনের কেউই নিজস্বতা থেকে এতটুকু বিচ্যুত না হয়েই কাছাকাছি এসেছেন — এ সম্পর্ক এতটাই বৌদ্ধিক।

এই বিভূতিভূষণই আবার নীরদচন্দ্রের কাছে ছুটে এসে জানান যে রিপন কলেজে তাঁদের এক সহপাঠী তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিও বটে, নিজের অল্পবয়সিনী, অনভিজ্ঞা স্ত্রীকে ছেড়ে নিজের শাশুড়ির প্রেমে পড়ে তাঁর সঙ্গে পলায়ন করেছেন, তাঁরই সঙ্গে বসবাসও করছেন। বিভূতিবাবুর মতে শাশুড়ি-ঠাকরুন খুবই আকর্ষণীয়া, অতএব দু-বন্ধু মিলে তাঁকে দেখে আসা যাক। নীরদবাবু আপত্তি জানালেন বটে কিন্তু বিভূতিভূষণকে দমাতে পারলেন না। তিনি গিয়ে দেখেশুনে নীরদচন্দ্রকে খবর দিলেন যে শাশুড়ি-ঠাকরুনটি অতি চমৎকার। আরও কিছুদিন বাদে তিনি খবর আনেন যে এখন শাশুড়ি-কন্যা-জামাতা একই সঙ্গে বসবাস করেন বটে। এরপরেও বিভূতিভূষণ ওই বাড়িতে যাতায়াত বজায় রাখেন এবং নীরদচন্দ্রকে এসে সংবাদ দেন যে একদিন শ্বশুর-মশাইটি এসে নিজের স্ত্রী এবং কন্যা, দুজনকেই নিয়ে চলে গেছেন, আর সে পণ্ডিত ব্যাটা এখন ভুঁড়ো শেয়াল হয়ে মরছে। নীরদচন্দ্রের ভাষায় এই খবরে বিভূতিভূষণের উল্লাস ছিল দেখবার মতো।

আবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলার সময় বিভূতিভূষণকে নীরদচন্দ্র উদ্ধার করেন বালির বস্তার পিছন থেকে। বিভূতিবাবুর কাতর অনুরোধ — আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, ট্রামে তুলে দাও। অথচ যে মুহূর্তে ট্রাম আসে, বিভূতিভূষণ নীরদচন্দ্রকে রাস্তায় ঠেলে ট্রামে উঠে চলে যান, ফিরেও তাকান না। হয়তো এইরকম অভিজ্ঞতা থেকেই নীরদচন্দ্র লেখেন যে বিভূতিভূষণ কাউকে নিবিড় করে ভালোবাসতে পারেননি, তাঁর সব ভালোবাসাই ছিল নিজেকে ঘিরে। ইগো-কেন্দ্রিক। নীরদচন্দ্র যখন নিজের প্রাণ বিপন্ন করে মুসলমানকে জল দিতে ছুটেছেন, বিভূতিভূষণ লুকিয়ে পড়েছেন আড়ালে। মনুষ্য-চরিত্র এমনই বিপরীতধর্মিতায় ভরা। নীরদচন্দ্র যেমন স্বকীয়তা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত নন, তেমনি পিছ-পা নন বিভূতিভূষণকে উন্মোচিত করতে। এবং তিনিই *পথের পাঁচালী*-র প্রথম পাঠক, প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই তার মধ্যে অযুত সম্ভাবনা খুঁজে পান তিনি, বিভূতিভূষণকে তাড়া দেন লেখা শেষ করার জন্য, অন্য লেখকরা এগিয়ে যাচ্ছেন যে।

মেসে তাঁরা যে জীবন কাটিয়েছেন, তার বিবৃতিতে বিভূতিভূষণ আরও জীবন্ত। ১৯২৩-এ প্রবল শঙ্খধ্বনিতে ভোর-রাত্রিবেলা নীরদচন্দ্রের ঘুম ভেঙে যায়, সে ছিল প্রবল ভূমিকম্প। বিভূতিভূষণকে কোথাও পাওয়া গেল না। আধঘণ্টা বাদে হন্তদন্ত হয়ে তিনি ফিরলেন। ভয়ানক ভীত। 'শঙ্খের শব্দ শুনেই বুঝেছিলুম ভূমিকম্প। টোকিওর কথা মনে পড়ে গেল। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম। তারপর কী হল আর জানি না। জ্ঞান ফিরলে দেখলুম ইস্টবেঙ্গল রেইলওয়ে ক্লাবের ফুটবল মাঠে শুয়ে আছি। মাথার উপরে আকাশ।' বিভূতিভূষণ প্রায় সিকি মাইল দৌড়ে, ছয়-ফিট উঁচু দেওয়াল টপকে মাঠে ঢুকেছিলেন, অথচ কিছুই তাঁর মনে নেই।

মেসে বিভূতিভূষণ একাই পশ্চিমবঙ্গীয় ছিলেন, অন্যান্যেরা সবাই, নীরদচন্দ্র সহ পূর্ববঙ্গীয়। বিভূতিভূষণ মেস-ম্যানেজার হলে তাঁর সঙ্গে বাকিদের বেশ খটাখটি লাগে। কোনো বিশেষ ব্যক্তির কল্যাণে পুলিশ এসে নীরদচন্দ্র সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে, সারারাত তাঁদের হাজত বাস হয়। নীরদচন্দ্র মেসে ফিরলে বিভূতিভূষণ বলেন যে যখন পুলিশ আসে তিনি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন, মাথার কাছে ওষুধের বোতল রাখা, কেউ জিজ্ঞাসা করলেই বলবেন, 'আমি কিছু জানি না।' অন্য কেউ হলে নীরদবাবু ভয়ানক রেগে যেতেন, কিন্তু বিভূতিভূষণ বলে হেসে উড়িয়ে দিলেন।

এর কারণ নীরদচন্দ্রই ব্যাখ্যা করেছেন — প্রতিভা যে কোনো শ্রেণিতেই থাকতে পারে, কিন্তু মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে শ্রেণির উপর। শ্রেণিসচেতন নীরদচন্দ্র তাই বলেছেন যে নিম্ন-মধ্য মানসিকতা বশত বিভূতিভূষণ বিপদ দেখলেই পালিয়ে যেতেন, সেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত মনই তাঁর কল্পনাশক্তিকে ইন্ধন জোগাত, অপু উঠে যেত সাধারণ জীবনের সব মালিন্যের ঊর্ধ্বে। ব্যক্তিমানুষ আর সৃষ্টিশীল লেখককে নীরদচন্দ্র নির্মোহ হয়েই বিশ্লেষণ করেছেন, কোথাও তাঁকে দেবতাও বানাননি, দয়াও করেননি, সাহিত্যিকের প্রাপ্য মর্যাদায় বিভূতিভূষণের মূল্যায়ন করেছেন, বন্ধুকে দিয়েছেন তাঁর প্রাপ্য প্রশ্রয়, তিরস্কার, সখ্য। একাধারে মমত্ব এবং কঠোর বিশ্লেষণের মানদণ্ডে বিভূতিভূষণ নৈর্বক্তিকভাবে মূল্যায়িত হয়েছেন।

ইহজীবনে করণিক রূপে যাহা কিছু পরীক্ষা দিয়া থাকি, সর্বাপেক্ষা আনন্দ পাইয়াছি একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক হইতে, যে বন্ধুত্ব যতদিন পর্যন্ত আমার বন্ধু জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত অটুট ছিল, এমনকী আমার বিবাহের পর আমার পত্নীও এই সম্পর্কের অংশীদার হইয়াছিলেন। এই বন্ধুটি সর্বার্থেই এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঙ্গকরণে ব্যানার্জি। এই সখ্যের সূত্রপাত অতর্কিতে।

৪১ মির্জাপুর স্ট্রীটে স্থিত হইবার পর দেখিলাম যে আমি সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছি এবং এক যুবক নীচে নামিতেছেন। গভীরভাবে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'নীরদ'। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই কে আমাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বোধন করিতেছে, কিন্তু মুহূর্তেই মুখখানি চিনিলাম : ১৯১৪ হইতে ১৯১৬ পর্যন্ত রিপন কলেজে আমার সহপাঠী। তখন যদিও সদ্য স্কুল-পাস, বিদ্বান ও পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। আমার সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, ভাবিতাম যে আর পাঁচজন তরুণ ধীমান বঙ্গতনয়ের ন্যায় তিনিও সমস্ত দৃশ্যমান বিষয়ে বড়ো বেশি কট্টরপন্থী ছিলেন। কিন্তু সেই পূর্বের ভাব আমার মনে ছিল না, পুরানো বন্ধুকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তিনি জানিতে চাহিলেন আমি কোথায় থাকি এবং যখন বলিলাম যে আমি ওই বাটিতেই থাকি, তিনি বলিলেন যে তিনি আমার সহিত আসিয়া দেখা করিবেন, ইহাও বলিলেন যে তিনি নিকটেই থাকেন।

তিনি সেই সন্ধ্যাতেই আসিলেন, এবং আমার পুস্তক সংগ্রহ দেখিয়া ভারি প্রীত হইলেন। তিনি বলিলেন যে সেই প্রথমবার নহে, দুই তিন বৎসর পূর্বে তিনি আমাকে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে

পাঠরত দেখিয়াছেন, তাঁহার ভাষায় পুস্তক পরিবৃত হইয়া। এবং তিনি দেখিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়াছেন যে এক প্রাক্তন সহপাঠি এখনও মননের সন্ধানে রহিয়াছে। তিনি বলিলেন যে তিনি আমাকে প্রশ্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার স্মৃতিতে কিছু ছিল না।

অতঃপর তিনি নিজের কথা বলিলেন। অর্থাভাবে তাঁহাকে স্নাতকোত্তর পড়া ছাড়িয়া দিতে হয়, এখন কলিকাতা হইতে কুড়ি মাইল দক্ষিণে একটি গ্রামীণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, নিত্য ট্রেনে যাতায়াত করেন। পরবর্তীতে জানি যে তিনি আমা হইতে তিন বৎসর অগ্রজ তথাপি বন্ধুদের ক্ষেত্রে কেহই কোনো বৈষম্য বোধ করি নাই। তিনি তখন অকৃতদার কিন্তু পরে জানিতে পারি যে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। কলেজে পাঠরত অবস্থাতেই তাঁহার বিবাহ হয় এবং ১৯১৮-র ভয়াবহ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারিতে তরুণী বধূটির মৃত্যু হয়, বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই।

আমরা অচিরেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম এবং ইহাও বলিতে পারি যে পারিবারিক সম্পর্কের বাহিরে যে তিন-চারিটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমার ছিল, তিনি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রথম সন্ধ্যাতেই তিনি আমাকে জানাইলেন যে বিখ্যাত বাংলা পত্রিকা *প্রবাসী*-তে তাঁহার একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পটির নাম বলিতেই আমার মনে পড়িল, আমি উহা পড়িয়াছি এবং যদিও লেখকের নাম মনে নাই, মনে হইয়াছিল তাহা মৌলিক এবং সূক্ষ্ম সংবেদনশীল রচনা। বলিতে পারি পরবর্তী দশবছরের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য বাংলা ঔপন্যাসিকদের অন্যতম হইয়াছিলেন। ১৯২৮-এ প্রকাশিত তাঁহার প্রথম উপন্যাস তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল এবং এখন ওই গ্রন্থটির সত্যজিৎ রায়-কৃত চলচ্চিত্র রূপ সারা বিশ্বে সমাদৃত হইয়াছে। ১৯২৪-এ প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়াই তিনি আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। আমি এত আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে তিন বৎসর কাল তাঁহাকে তাড়া দিয়া চলি। ১৯২৮-এ উহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবার পর আমি এক প্রকাশক খুঁজিয়া পাই যিনি উহা গ্রন্থাকারে ছাপিতে সম্মত হন।

তিনি মননশীল কথোপকথন চাহিতেন। অত্যন্ত একাকী বোধ করিতেন। সঙ্গ কামনা করিতেন। তাই প্রায়ই সন্ধ্যাকালে আসিয়া আমার সহিত সময় কাটাইতেন। ছাত্রাবস্থার এবং স্ত্রী-বিয়োগের পর যে জীবনের কথা বলিতেন, তাহাতে আমি অতি বিপন্ন বোধ করিতাম। কলেজে পাঠকালীন তিনি যে আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পড়াশুনা করিতেছেন, তাহার কিছুই জানিতাম না। আমাকে যাহা বলিতেন তাহা পরবর্তী সময়ে তাঁহার উপন্যাস *অপরাজিত*-তে ব্যক্ত হয়। তিনিই অপরাজিত। ওই গল্পটিও দুইটি ভাগে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রায়িত করেন, যাঁহারা ছবিগুলি দেখিয়াছেন, বুঝিবেন যে বিভূতিবাবু কী সংঘর্ষ করিয়াছেন। অবশ্যই, তিনিই অপরাজিত। আমি কখনো এই রূপ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি নাই এবং জীবনে সংঘর্ষের কোনো ধারণা ছিল না।

জাতিগতভাবে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ, সামাজিক স্তরে তাঁহার পারিবারিক অবস্থান অত্যন্ত নিম্ন। তাঁহার পিতা ছিলেন পুরাণ-পাঠক। পৌরহিত্যের কুল-মর্যাদায় ইঁহাদের স্থান নীচে। এই মানুষটি দরিদ্র, তদুপরি ছন্নছাড়া। কিন্তু তিনি এক বিশেষ চরিত্র, দিনলিপি লেখেন, তদুপরি কবিতাও লেখেন, দিনলিপিটি তাঁহার জীবনীকার ব্যবহার করিয়াছেন। এইসবই আমি পরবর্তী সময়ে জানিয়াছি, কারণ তিনি নিজের পিতা এবং প্রপিতামহদের সম্পর্কে কথা বলিতে নিতান্ত অনাগ্রহী

ছিলেন। তিনি তাঁহাদের কিছু রহস্যাবৃত রাখিতেন। আমি কিঞ্চিৎ অবাক হইতাম, কারণ আমার শ্রেণীতে পূর্বসূরীদের কথা বলা এবং বংশ-গর্ব স্বাভাবিক ছিল।

তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইলে একপ্রকার মানসিক সখ্য গঠিত হইল। ব্যাখ্যা করি এই যে, বঙ্গসমাজে যাহা সামাজিক-জীবন বলিয়া গণ্য পাশ্চাত্যসমাজে তাহা কেবলমাত্র পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমায়িত। তরুণ বাঙ্গালীকে যাহা আকৃষ্ট করে তাহা হইল মানসিক সাযুজ্য, মননশীলতা, রুচিবোধ। এই সম্পর্কে অর্থ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা কোনো বাধা হইয়া দাঁড়ায় না।

তাঁহার মানসিকতার প্রতি আমার গভীর ভক্তি ছিল। তাঁহার মনের বিশাল প্রসারতা ছিল। কিন্তু আমি আশা করি নাই তাঁহার শ্রেণী ও শিক্ষাগত যোগ্যতার মানুষ জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা বা মানব প্যালিওন্টোলজি (পৃথিবীতে জীবনসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টির ইতিহাসের উপাদান সরবরাহকর জীবাশ্ম সংক্রান্ত বিজ্ঞান) সম্পর্কে উৎসাহিত হইবেন। তিনি আমার কাছে মাউন্ট উইলসন অবসার্ভেটরির ই পি হাবল সম্পর্কে কথা বলিতেন, যদিও তিনি গণিত বা পদার্থবিদ্যার ছাত্র নহেন, তাহা সত্ত্বেও। আমি জীন্স বা এডিংটনের কথা শুনিয়াছিলাম, অল্পবিস্তর তাঁহাদের সম্পর্কে শুনিয়াছিলাম। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের গ্রন্থটিও আমার ছিল। কিন্তু আমি হাবলের কথা শুনি নাই। বিভূতিবাবু আমাকে স্যর আর্থার কেইথের *অ্যান্টিকুইটি অব ম্যান* ও দেখাইয়াছিলেন। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও তিনি উহা কিনিয়াছিলেন। তৎকালে মানব প্যালিওন্টোলজি এবং প্রাগৈতিহাসিকতা সম্পর্কে আমি অজ্ঞ ছিলাম, তিনি আমার মধ্যে এমন আগ্রহ সৃষ্টি করিলেন যে আমি শীঘ্রই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গেলাম। শুধু বোলের *লে হোম'স ফসিলস*-ই পড়িলাম না, অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থও পড়িলাম। প্যালিওলিথিক শিল্প সম্বন্ধিত বিশাল গ্রন্থাদি, পিয়েতে, কারাইলাক, ব্রেউইল এবং অন্যান্যদের কাজ পারী হইতে আনাইলাম। যখন ১৯২৩-এ বার্কিটের *প্রিহিস্ট্রি* প্রকাশিত হইল, আমি নিজে পড়িবার জন্য তৎক্ষণাৎ বিভূতিবাবুকে দিয়া উহা কিনাইলাম।

অচিরেই আবিষ্কার করিলাম যে এই সকল বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ বিজ্ঞানসম্মত নহে। তিনি আপাদমস্তক রোমান্টিক এবং সেইজন্যই উহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। দরিদ্র না হইয়া যদি তিনি ও তাঁহার পরিবার সম্পদশালীও হইতেন, তবুও তিনি রোমান্টিক রহিতেন, কারণ ওই শ্রেণীর সাধারণ সাচ্ছন্দ্য তাঁহার সহ্য হইত না এবং তিনি উহা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহার দারিদ্র-তাড়িত একঘেয়ে জীবনে রোমান্টিকতা ছিল তাঁহার মানসিক অস্তিত্বের শর্ত। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে ছাত্রাবস্থাতেও তিনি শুধু পরীক্ষার জন্য পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নাই। হাতে যাহা আসিত তাহাই পড়িতেন। পরীক্ষায় ভালো ফল করেন নাই, কিন্তু লেখক হইয়াছিলেন।

স্ত্রী-বিয়োগ এবং শিক্ষকতা গ্রহণের সহিত প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৎকালে শিক্ষকরা অত্যন্ত কম বেতনভোগী ছিলেন, চাকুরিতে ঢুকিবার কালে মাসান্তে তিন পাউন্ডের অধিক রোজগার করিবার আশা করিতেন না। অতএব কষ্টে সংসার চালাইতেন। নিকৃষ্ট বিষয় এই যে ইহার ফলে তাঁহাদের মানসিক দৈন্য আসিত। কলিকাতায় বসবাসকারী যাঁহারা, তাঁহারা সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক

মহলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের তোষামুদি করিয়া অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু যে গ্রামে বিভূতিবাবু কাজ করিতেন, সেখানে ঐরূপ সম্ভাবনা ছিল না। গ্রামজীবন এমনই দীন, সামান্য যে তাহার সমস্ত ঐতিহ্য সত্ত্বেও তাহা সভ্য হিন্দু-সমাজের প্রস্তরীভূত অস্তিত্ব মাত্র। উত্তর কলিকাতা হইতে কিছু দূরে গ্রামখানি, প্রথমে তিনি যেখানে কাজ করিতেন তাহা সাধারণ গ্রাম অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তিনি কাহারো সহিত কথা বলিতে পারিতেন না এবং রেল-স্টেশনের নিকট বাজারে থাকিতেন।

সর্বোপরি ছিল তাঁহার শোকের রিক্ততা। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন কীভাবে তিনি তাঁহার বিষণ্ণ ঘরটিতে বসিয়া থাকিতেন মৃদু তৈলপ্রদীপের আলোকে। কলিকাতা হইতে আগত শেষ ট্রেনের বাঁশি মনে করাইয়া দিত যে ঘুমাইবার সময় হইয়াছে। স্ত্রীর স্মৃতি তাঁহাকে তেইশ বৎসর বিবাহ করিতে দেয় নাই। সর্বদা তাঁহার বুক-পকেটে এক তাড়া কাগজ থাকিত, আর বালিশের পাশে একখানি সূচীশিল্প করা হাত পাখা। এ সম্বন্ধে তিনি কখনো কিছু বলেন নাই, আমিও কিছু প্রশ্ন করি নাই। আমি ও অন্যান্য বন্ধুরা বারংবার তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিয়া স্থিত হইতে বলিতাম, সম্বন্ধও আনিতাম। তিনি আগ্রহভরে সব দেখিতেন, পাত্রী দেখিতেও যাইতেন। এক দুইবার কথা অগ্রসরও হইয়াছিল। কিন্তু শেষে তিনি এড়াইয়া যাইতেন। আমি তিনবার তাঁহার সহিত পাত্রী দেখিতে গিয়াছিলাম।

পত্নী-বিয়োগ তাঁহাকে এমন দিকে উৎসাহিত করিয়াছিল যে আমি তাহার অংশীদার হইতে পারি নাই। তাহা হইল আধ্যাত্মিকতা। ইতিমধ্যেই তিনি মেয়ার্স, লজ এবং কোনান ডয়েল পড়িয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান প্রদর্শন করিয়া তিনি আমাকে ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত করিতে চাহিতেন। এক বিশেষ লেখকের প্রতি তাঁহার দুর্বলতা আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি ছিলেন জার্মান শ্রেংক-নজিং। এক্টোপ্লাজমিক আকৃতির উপর তাঁহার ধারণা আমার বিরক্তি উদ্রেক করে। কিন্তু যেইরূপ তিনি আমাকে বিশ্বাস করাইতে পারেন নাই, আমিও মানবাত্মার অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাস টলাইতে পারি নাই। অবশেষে আমরা একমত হই যে এই বিষয়ে আর আলোচনা করিব না। অন্য বিষয়ে আমরা অবিশ্রান্ত কথা বলিতাম। শুনিতাম তিনি নিজের বিশ্বাস কীভাবে প্রচার করিতেন, এমনকী শেষজীবনে তিনি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন আধিভৌতিক বিষয়ে। এই সম্পর্কে, অর্থাৎ মৃত্যু বিষয়ে তিনি গভীরতর আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, শিশু-কন্যার মৃত্যুতে লেখা ডীন হিঞ্জের গ্রন্থটি কিনিয়া। আমি তাঁহার কাছ হইতে লইয়া উহা পড়িয়াছিলাম এবং গভীরভাবে আপ্লুত হইয়াছিলাম।

আমি স্পষ্ট বুঝিতাম কেন তিনি আধ্যাত্মিক হইয়াছেন। কিন্তু কখনো আর্গুমেন্টাম অ্যাড হোমিনেম এর ব্যবহারপূর্বক তাঁহার আবেগকে আহত করি নাই। ধীরে ধীরে তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি পরিবর্তন দেখিতে পাইতেছিলাম। যদি প্রথমদিকে তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে মৃত স্ত্রীর নিমিত্ত পরলোকে বিশ্বাস করা, পরবর্তী জীবনকে ভালোবাসিয়াই তিনি ওই বিশ্বাস আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। অতএব পরলোকে বিশ্বাস তাঁহার বিশ্বাস নয়, কুসংস্কার হইয়া উঠিয়াছিল। তবু আমি বুঝিতাম যে তিনি ধার্মিক নহেন। তিনি কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত ধারাবাহিকতাটুকু বজায় রাখিতে চাহিতেন। আমার সন্দেহ যে বৈজ্ঞানিক সৌরবিজ্ঞান বা প্রাগৈতিহাসিকতা সম্পর্কে তাঁহার

আগ্রহ আদতে তাঁহার জগতে মৃতদের জন্য একটি সৌর অবস্থান খুঁজিবার প্রয়াস এবং আকুলতা। মৃত্যুমুখেও তিনি ইহা খুঁজিয়াছেন। ১৯৫০-এ মাত্র ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যাহা হউক, তিনি যে সর্বদা পরলোক লইয়া হা-হুতাশ করিতেন, তাহা নহে। বিপরীতে, তিনি অতি বাস্তববাদী ও স্থিতধী ছিলেন। সত্যই, তাঁহার উপন্যাসে তিনি প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি লইয়া গভীর ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কঠিন জীবন তাঁহাকে তিক্ত করে নাই। বিগতস্পৃহও হন নাই। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল অপ্রতিম। আমাদিগের সমাজে মানুষ যে দৈন্যের মধ্যে বাস করে, তাহাতেও তিনি বিরক্ত হইতেন না। যাহা করিয়াই হউক, তিনি তাহাদিগকে পারিপার্শ্বিকের ঊর্ধ্বে বিচরণ করাইতেন। তাহাদের পৃথিবী হইতে বহু ঊর্ধ্বে।

কিন্তু তিনি নিজে যে ভাবে থাকিতেন, তাহা বাঙ্গালী নিম্ন-মধ্যবিত্তের ক্লান্তিকর জীবন, এমনকী যখন তাঁহার সঙ্গতি হইয়াছিল, তখনও। তিনি জীবনের বাহ্যিক প্রয়োজন সম্পর্কে যথেষ্ট সংবেদনশীল ছিলেন না, অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে অতিরিক্ত, আত্মসচেতনভাবে সংবেদনশীল ছিলেন। আমার সহিত তাঁহার মৌলিক পার্থক্য এই যে তিনি মনুষ্য-কৃত সৌন্দর্য লইয়া সচেতন ছিলেন না। তাঁহার ঘর সুসজ্জিত ছিল না, এমনকী পরিষ্কারও নহে। মাঝে মাঝে আমি গুছাইয়া দিতাম। তিনি সুবেশ ছিলেন না, সুসজ্জিত জীবনের কোনো ধারণাই তাঁহার ছিল না।

বহু বৎসর পর, আমার বিবাহ পরবর্তীকালে, তিনি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ভারী বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত আসিয়া পছন্দ-অপছন্দের গল্প করিতেন। কিন্তু বৈঠকখানায় না বসিয়া তিনি নির্বিকার, শান্তভাবে বিড়ি টানিতে টানিতে সোজা তাঁহার শয়ন কক্ষে চলিয়া যাইতেন এবং সুচী-শিল্প করা চাদরের উপর বসিয়া, দুর্গন্ধময় নিম্ন মধ্যবিত্ত গন্ধ ছড়াইতেন। আমার স্ত্রী তাঁহাকে বিড়ি ফেলিতে বাধ্য করিয়া, ভৃত্যকে দিয়া একপ্যাকেট খ্যাতনামা সিগারেট আনাইয়া দিতেন।

কিন্তু দীনহীন জীবনের প্রতি তাঁহার আনুগত্যের ভালো দিক হইল এই যে কদাপি তিনি ধনীদিগের সম্পদ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, তাহাদিগের বশবর্তী হন নাই। তাহাদিগকে ঈর্ষা করেন নাই। কিছুদিন তিনি কলিকাতার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী পরিবারে গৃহশিক্ষকতা করিয়াছিলেন। ওই গৃহের বৈঠকখানা অবিকল ইংরাজ উদ্যান-বাটিকার অনুরূপ ছিল। এইসব গৃহের অন্দরসজ্জা ব্রিটিশ সজ্জাকারীগণ করিতেন, ইংল্যান্ড হইতে আসবাব আসিত। একদা তিনি আমাকে বৈঠকখানাটি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু উহা কেমন দেখিতে বা কী কী আছে সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন ছিলেন। তাঁহার নিয়োগকারীর গাড়িখানি একটি বিপুলাকৃতি ক্যাডিলাক সম্পর্কেও তিনি নিরাসক্ত ছিলেন। আবার, গৃহকর্তা এবং তাঁহার আচরণ লইয়া তিনি দ্বেষবিহীনভাবে দুষ্টামিপূর্ণ বিবরণ দিতেন। খুব কম ব্যক্তিকেই দেখিয়াছি, তাঁহার মতো বাহ্যিক আড়ম্বর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, নির্বিকার, অকুতোভয়।

বিভূতিবাবু বারংবার আমার জীবনের গল্পে আসিবেন। এইমুহূর্তে, আমি শুধু বলিব, কী করিয়া মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহাকে ৪১ মির্জাপুর স্ট্রীটে, আমার ঘরটির ঠিক উপরস্থ একটি

সাথে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। এই ঘরটিতে, প্রায় কুড়ি বৎসর কাল, তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের প্রাক্কাল পর্যন্ত, তিনি বসবাস করিয়াছেন। মাঝেমধ্যে অন্যত্র যাইতেন।

এক বৈকালে, আমার সহিত প্রথম দেখা হইবার কয়েক সপ্তাহ পর, তিনি হঠাৎ খুব গর্বিতভাবে, গাঁদাফুলের মালা পরিয়া আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন যে বিদ্যালয় হইতে অবসর লইয়া, বিদায় সংবর্ধনা হইতে আসিয়াছেন। খুব আশ্চর্য হইলাম কারণ তিনি বলিলেন যে কোনো নূতন, ভালো চাকুরিতে যোগ দিবেন না, বরং বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ জানিবার জন্য তাঁহাকে চাপাচাপি করি নাই, তিনিও আমাকে বলেন নাই যে বেকারত্বের দিনগুলি কীভাবে কাটাইয়াছেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি নূতন কাজ পাইলেন এবং তাহার পর জানিলাম যে উহা পাইবার পূর্বে মাঝেমধ্যে অনাহারে কাটাইয়াছেন। কখনো কয়েক পয়সার চানা খাইতেন, কখনো দোকানী ধারে তাঁহাকে পুরা-পেট খাইতে দিত। তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম যে তাঁহার আমার অতিথি হওয়া উচিত ছিল। তিনি শুধু বলিলেন যে আমাকে বিব্রত করিতে চাহেন নাই।

তাঁহার চাকুরিটি অদ্ভুত। মাড়োয়ারি লক্ষপতি কেশোরাম পোদ্দার কলিকাতায় যে গো-রক্ষা-সমাজ চালাইতেন, তাহার হইয়া গো-হত্যার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়া ছিল তাঁহার কাজ। তিনি অতি সরসভাবে ওই মহান ব্যক্তির দরবারটি বর্ণনা করিতেন, বিশেষত কীভাবে তিনি আধ-ডজন টেলিফোন পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিতেন, তাঁহার স্টক মার্কেটের খবর আসিত তাহাতে। অতএব, মাঝেমাঝেই তিনি চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে যাইতেন, ওই মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে গো-হত্যা রোধ করিতে। তিনি বলিতেন যে ওই বক্তৃতার্থে-ভ্রমণ তাঁহাকে ভাষণ দিতে শিক্ষা দিয়াছিল। পরবর্তীকালে তিনি সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিতেন। এরপরই তিনি ওই চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতার এক জমিদারের ব্যক্তিগত সচিবের কাজ নিলেন। আমি তাঁহাকে আমি যে বোর্ডিঙে থাকিতাম, সেখানে আসিয়া থাকিতে বলিলাম, যে ঘরখানি তাঁহার জন্য বলিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহারো ব্যবস্থা করিলাম। তিনি সেই ঘরটি প্রথম কিছুদিন আরেক সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের সহিত ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।

এইসময়ে আমি তাঁহার পদত্যাগের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। উহার পিছনে এক রোমান্টিক ইতিহাস ছিল। কলিকাতার দক্ষিণের স্কুলটিতে কাজ করিবার সময় তিনি গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে থাকিতেন। সেই পরিবারে একটি তরুণী ছিল। সে লক্ষ করিয়াছিল যে তিনি মোটেই নিজের দেখাশুনা করিতে পারেন না, কাজেই তিনি যখন বিদ্যালয়ে থাকিতেন, সে ঘরে আসিয়া ঘরটি গুছাইয়া সব পরিপাটি করিয়া রাখিত। তাঁহার প্রতি তরুণীটির একটি আকর্ষণ ছিল, ইহাকে প্রেম বলা যাইতে পারে। কিছুকাল পর হইতে সে পত্র লিখিতে শুরু করিল। আমি সে-সকল পড়িয়াছি, যতদূর মনে পড়ে, দশখানি পত্র হইবে। একেবারে প্রেম-বিষয়ক কোনো শব্দ ছিল না, কিন্তু পত্রের ভাব বুঝিতে অসুবিধা ছিল না। এত সরল, সাধারণ, পবিত্র পত্র আমি পড়ি নাই। পত্রে তাঁহাকে সেবা করিবার আকুলতা, যেন বলিতেছে, 'আমি আপনার দাসী।' কিন্তু মেয়েটি তাঁহার সমকৌলীণ্যের ব্রাহ্মণ নহে, ওই সময়ে বিবাহের কোনো প্রশ্নই ছিল না। অস্বস্তি এড়াইতে, তিনি প্রথমে কলিকাতা চলিয়া আসিলেন, তাহার পর চাকুরি হইতে পদত্যাগ করিলেন।

এইটি তাঁহার প্রথম হৃদয়-ঘটিত সমস্যা নহে, এইরূপ অনেক ছিল এবং তাহা শুরু হইত এবং চলিত নারীদের দিক হইতেই। তিনি নারীদের নিকট আকর্ষক ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁহার সাহিত্য-খ্যাতি এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। তখন উচ্চ-শিক্ষারত বাঙ্গালী মেয়েদের প্রিয় সাহিত্যিকের প্রেমে পড়ার রেওয়াজ ছিল, অবশ্যই আমার ন্যায় লেখকের নহে, কবি-ঔপন্যাসিকদিগেরই সেই সৌভাগ্য হইত। না-দেখিয়াই মেয়েরা তাঁহাদের প্রেমে পড়িয়া যাইত, তাহার পর ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইতে চাহিত — একমাত্র উদ্দেশ্য বীরপূজা। এইসব প্রেমনিবেদন সবসময় যে বিভূতিবাবু এইরূপ কঠোরভাবে পরিত্যাগ করিতেন তাহা নহে, বরং নিজেকে কিছুমাত্র না জড়াইয়া খেলাটি উপভোগ করিতেন। তিনি ইহাও দেখিতেন যাহাতে মেয়েগুলি অধিক দুঃখ না পায়। যদি সেইসময় আমার ট্রলোপ পড়া থাকিত, আমি তাহাকে জনি এমসের সহিত তুলনা করিতাম।

আমি যতদিন বিবাহ করি নাই, ততদিন পর্যন্ত তিনি আমাকে আসিয়া এইসকল গল্প বলিতেন। আমি সর্বদা তাঁহাকে বকিতাম। তিনি কিছু গায়ে মাখিতেন না, আমাকে গোঁড়া, কট্টরপন্থী ভাবিতেন, নিদেনপক্ষে ল্যাজ-কাটা শৃগাল। আমার বিবাহের পর তিনি এইসব কথা আমার স্ত্রীকেই বলিতেন। তিনিও খুব আমোদ সহকারে সব শুনিতেন, এমনকী যখন তিনি চার ফীট উচ্চতার বছর বারোর এক বালিকাকে লইয়া আসিলেন এবং আমার স্ত্রীর বিছানায় তাহার ক্ষুদ্র হস্তখানি নিজের সুবিশালহস্তে জড়াইয়া বসিয়া থাকিলেন, তাহাও আমার স্ত্রী সহ্য করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটি প্রেম-কাহিনী তাঁহার বিরক্তি উদ্রেক করে। একটি ভারী উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছিল এবং তাহার এক নিবেদিত-প্রাণ প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এই মেয়েটি আমার স্ত্রীর অতি পরিচিত এবং ওই প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের এক দূত আসিয়া আমার স্ত্রীর কাছে প্রেমিকের দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করে। আমার স্ত্রী বিভূতিবাবুকে এক সুবিশাল ভাষণ দিলেন, তাঁহার কোনো ভাবান্তর হইল না। যাহাকে লইয়া তাঁহার বিন্দুমাত্রও কোনো পরিকল্পনা ছিল না, তাহাকে দেখিবার জন্য তিনি দীর্ঘ তিনশো মাইলের কষ্টকর যাত্রাও করিতে পারিতেন।

শেষ খেলাটি বিভূতিবাবু বড়োই ভালো খেলিলেন। সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তিনি অবশ্য কিছুমাত্র শাস্তি ভোগ করেন নাই। দিব্যসুখে জীবন কাটাইয়াছেন। আমার স্ত্রীর নিকট তিনি আসিতেন, দাম্পত্য-সুখের কাহিনী বলিতেন। খুব সকালে তিনি যাহাতে বাহির হইতে না পারেন, সেইহেতু তিনি তাঁহার শাড়ির আঁচলের সহিত বিভূতিবাবুর ধুতির খুঁট বাঁধিয়া রাখিতেন। বাঙ্গালীকে বাঁধিয়া রাখিবার এইটি প্রকৃষ্ট উপায়। আমার ক্ষেত্রেও বিভূতিবাবু এই উপায় অবলম্বন করিতেন। যখনি তাঁহাকে দেখিতে গিয়া উঠিবার উপক্রম করিতাম, তিনি আমার ধুতির প্রান্তভাগ শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতেন। সেই অবস্থায়, আমরা যেরূপে ধুতি পরিধান করি, তাহাতে ধুতি খুলিয়া যাওয়া ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না।

যখন তাঁহার কোনো প্রেমঘটিত সম্পর্ক ছিল না, তখনো স্ত্রীলোক সম্পর্কে তাঁহার অদম্য কৌতূহল ছিল। ফলত তিনি অত্যন্ত হাস্যকর অবস্থায় পড়িতেন। কয়েকটি উদাহরণ দেই। যখন

তাঁহার বয়স চারি-পাঁচ, তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া, শহরের এক কুখ্যাত স্থানে, বস্তিতে ঘর ভাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বাটির নিকটেই একটি উত্তম বাটি ছিল, সেইখানে এক রক্ষিতা থাকিত। সে শিশু বিভূতিভূষণকে ডাকিয়া কথা বলিত, খেলিত। তাঁহার পিতা একজন স্বাভাবিক অভিভাবক হইলে এইরূপ ঘটিত না। তিনি তাহা ছিলেন না এবং শিশু বিভূতিভূষণ ওই স্ত্রীলোকের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, সন্ধ্যার সময় তিনি বলিতেন, 'বাছা, এইবার বাড়ি যাও। আমার বাবু আসিবেন।' এইসকল ১৯০০ সালের পূর্বের কথা।

১৯২৫ সাল নাগাদ একদিন তিনি আমি মির্জাপুর স্ট্রীট ত্যাগ করিবার পর আমার ভ্রাতাদিগের সহিত যে বাটিতে থাকিতাম, সেইস্থলে আসিলেন, ভয়ানক আতঙ্কিত, যেন ওয়েলিংটন ওয়াটারলুর কথা বলিবেন — 'চমৎকার দৃশ্য, এমনটি জীবনে দ্যাখো নাই।' গল্পটি হইল এই তাঁহার ওই গৃহ এবং অঞ্চলটি বেশ মনে ছিল, এবং ওই মহিলাকে একবার দেখিবার অদম্য ইচ্ছা সংবরণ করিতে না পারিয়া, তিনি ওইস্থলে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ওই স্থলটি একটি বেশ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। যখন সেইখানকার যুবতীরা আমার বন্ধু এবং তাঁহার আগ্রহ দেখিল, তাহারা তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, প্রত্যেকে তাঁহাকে স্বীয় ঘরে লইয়া যাইতে চাহে। বিভূতিবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি জোরগলায় তাঁহার অসহায় সরলতার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু উহারা উচ্চস্বরে নিষ্ঠুর হাসিয়া, তাহা উড়াইয়া দেয়। প্রথমে আমিও হাসিতে উচ্ছ্বাসিয়া উঠি। পরে অবশ্য তাঁহাকে সাধারণ জ্ঞানের কথা কিছু বলিয়াছিলাম।

আবার প্রায় ওই একই সময়ে তিনি আসিয়া আমাকে বলেন যে মেয়েটির জন্য তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিতে যাইতেছেন, কারণ তিনি শুনিয়াছেন যে মেয়েটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি দেখিতে চাহেন যে সে সুখী কি না। আমি আতঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলাম। কিন্তু অবশ্যই তিনি শুনিলেন না। পরের দিন তিনি আবার আসিলেন এবং তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম যে দর্শন কেমন হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে তিনি স্টেশন ফিরত আসিতেছেন এবং গল্পটি বলিলেন। তিনি সেইখানে গিয়া সাদর অভ্যর্থনাই পাইয়াছিলেন কিন্তু মেয়েটির খোঁজ লইবার পূর্বেই অন্দরমহল হইতে তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, সবিনয়ে তাঁহারা জানাইলেন যে তাঁহাদিগের ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রসববেদনা উঠিয়াছে। বিভূতিবাবু বলিলেন যে তিনি অতঃপর আর একটিও কথা শুনিবার জন্য দাঁড়ান নাই, প্রাণ লইয়া পলাইয়াছেন। আমি শুধু বলিলাম যে তাঁহার যোগ্য শাস্তি হইয়াছে।

অন্য এক উপলক্ষ্যে, যখন তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশোর্ধ, এক অতি দুষ্টামিবুদ্ধি সম্পন্ন লেখক-বন্ধু তাঁহার সহিত এক নিষ্ঠুর রসিকতা করিয়াছিলেন। বিভূতিবাবু রাগে ফুঁসিতে-ফুঁসিতে আমার কাছে আসিয়া নালিশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে ওই দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে রাত্রি নয়টার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দাঁড়াইলে তিনি তাঁহাকে এক অ্যাংলো-ভারতীয় (ইউরেশিয়ান) গণিকা দেখাইবেন। তিনি গিয়াছিলেন এবং নভেম্বর মাসের ঠান্ডায় দুই ঘণ্টা বসিয়াছিলেন কিন্তু না আসিলেন বন্ধু, না আসিলেন গণিকা। 'এর চেয়ে বড় প্রতারণা কিছু হয়?' বিভূতিবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কৌতূহলের কারণ সেইসময় বাঙ্গালী যুব-সমাজে ইউরেশিয়ান গণিকারা দুষ্প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইতেন এবং তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন যে ওই

খ্যাতি যথার্থ কি না। আমি জানিতাম যে ওই মহিলা যদি আসিতেনও বিভূতিবাবু আগের বারের মতোই পলায়ন করিতেন। এইবার আমার মেজাজ ভালো ছিল না, আমি বলিয়াছিলাম যে তাঁহার কিছু আত্মমর্যাদা বোধ থাকা দরকার, অই জাতীয় কৌতূহল দ্বারা তাড়িত না হওয়া প্রয়োজন, বিশেষত আমরা যখন ওই লেখক বন্ধুর চরিত্র কেমন তাহা জানি।

সম্ভবত এইসকল দুর্বলতার পিছনে কারণ ছিল তাঁহার রূপ সম্পর্কিত সচেতনতা। তাঁহার উচ্চতা মধ্যম মানের, শারীরিকভাবে অনাকর্ষণীয় নহেন। তাঁহার অভিব্যক্তি অতি বুদ্ধিদীপ্ত, সুন্দর। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তাঁহাকে সুদর্শন বলিবে না। যাহা হউক তিনি সেইসব গায়ে মাখিতেন না, এবং আমাকে আমার ক্ষুদ্র চক্ষু লইয়া খেপাইতেন। বলিতেন যে আমার চক্ষুদ্বয় শামুকের মতন এবং তাঁহার নিজের চক্ষু সুবিশাল, আয়ত।

নিজেকে লইয়া তিনি অতিশয় মুগ্ধ থাকিতেন, নিজের ব্যক্তিত্বে মোহিত। তলস্তয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পীস* তাঁহার প্রিয় ছিল, আমারও এবং তিনি আমাকে প্রায়ই বলিতেন যে তাঁহার চরিত্র পিটার বেজুকভের মতো। আমারও আত্ম-প্রীতি কিছু কম ছিল না, তৎক্ষণাৎ বলিলাম যে আমি হইলাম রাজপুত্র অ্যান্ড্রু ব্যালকন্সকি। তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচ্ছা, বরিস দ্রুবেৎস্কি কে?' আমার নিঃশ্বাস ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমার কি মনে হয় না সে অমুক?' বলিয়া এক বন্ধুর নাম করিলেন, যাঁহাকে তিনি নামেমাত্র চিনিতেন। সেই বন্ধুটি, তাঁহার অনেক গুণ সত্ত্বেও চাটুকার ছিলেন এবং কলিকাতার উচ্চ মহলে স্বীয় স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। আমি আশা করি নাই যে বিভূতিবাবু এমন চরিত্র নিরূপণ করিতে পারিবেন।

এইসব শিশুসুলভ দুর্বলতা তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইত। ইহা তাঁহাকে আরও প্রিয়তর করিয়া তুলিত। কিন্তু তাঁহার একটি চরিত্র-লক্ষণ, প্রায় দুই-দশক তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতার পর আমাকে বিরক্ত ও আশ্চর্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার বাহ্যিক নরম প্রকৃতির অন্তরালে এক ধরনের কাঠিন্য ছিল, ফলত কাহারো সহিত তাঁহার গভীর আন্তরিক আদান-প্রদান হইত না। তাঁহার গল্পে-কাহিনীতে সাধারণ মানুষের আনন্দ এবং দুঃখের প্রতি সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়, তিনি ব্যক্তি চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে দেখিয়াছি যে খুব নিকট জনের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারিতেন। হয়তো ইহা তাঁহার অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের ফল অথবা প্রথম জীবনের দুঃখ তাঁহার ভিতর এক নির্বিকল্প উদাসীনতা তৈয়ার করিয়াছিল। শুনিয়াছিলাম তাঁহার বৃদ্ধ-বয়সের পুত্রটি তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। কিন্তু ওই প্রকারের ভালোবাসা আত্ম-প্রীতিরই নামান্তর।

যাহাই হউক, তাঁহার আত্মকেন্দ্রিকতার কিছু সুফলও ছিল, তিনি সমসাময়িক লেখকদিগের প্রতি কখনো ঈর্ষান্বিত হন নাই। এই গুণ লেখক-কুলে বিরল, বঙ্গে তো আরও কম। একদা যখন আমার মনে হইল যে তাঁহার প্রথম উপন্যাসটি শেষ করিতে তিনি বড়ো আলস্য করিতেছেন, আমি তাঁহাকে দ্রুত শেষ করিতে লিখিয়াছিলাম, কারণ ইতিমধ্যে অন্যান্যেরা, তাঁহার মতো দক্ষতা ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহার কিছু যায়-আসে না, তিনি কাহারো সাফল্যে ক্ষুব্ধ নহেন। তিনি তাঁহার মতো করিয়া, সময় লইয়া কাজ করিবেন এবং তাহাই তিনি করিয়াছিলেন।